শহরাঞ্চলে অসংগঠিত মহিলা শ্রমিক হিসেবে গৃহসেবিকাদের ভূমিকা

গৌতম জাতুয়া[১]
ড. দেবাশীষ কুমার মন্ডল[২]

সংক্ষিপ্তসার :

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে শহরাঞ্চলে গৃহসেবিকাদে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে এদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য কলকাতার অন্তগর্ত ১০৯ নং ওয়ার্ডের ৩০০ জন গৃহসেবিকাদের উপর একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে গৃহসেবিকাদের এই পেশায় আসার কারণ, সম্প্রদায়গত, শ্রেণিগত ও জাতিগত বিভাজন, কাজের ধরন, মাসিক উপার্জন সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত করা হয়েছে। এবং এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

মূল শব্দ : গৃহসেবিকা, অসংগঠিত, মানবসম্পদ, আর্থ-সামাজিক।

ভূমিকা :

অর্থনীতি ও সমাজনীতি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। তাই সমাজে নারীর ভূমিকা কি তা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে হবে না। সমাজে নারীর অবস্থান থেকেই কোনো দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়তে নারীর অবদানের স্বরূপটি স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়।

সমগ্র বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব পুঁজির প্রয়োজন তাদের মধ্যে মানবসম্পদ বিশেষতঃ মহিলা বা নারী শ্রমিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ বর্তমানে মহিলারা অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে দেশের বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে (যেমন—দিন মজুরী, পণ্য বিক্রেতা হকার, কর্মচারী হিসেবে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক্ষেত্রে গৃহসেবিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের নব প্রেক্ষাপটে এদের চাহিদা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। এই নারীকর্মী বা নারী সম্পদ সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে তার সঠিক মূল্যায়ন সঠিকভাবে তুলে ধরা আজকের দিনে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

উদ্দেশ্য :

বর্তমানে কাজটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরাঞ্চলে সংগঠিত শ্রমিক হিসেবে গৃহসেবিকাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

গৃহসেবিকাদের সামাজিক ভূমিকা ও গুরুত্ব :

আমরা জানি অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে সমাজে গৃহসেবিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে একজনের উপার্জিত অর্থে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে বা কিছু ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা বুঝে স্বামীর পাশাপাশি গৃহবধূরা বাড়ীর বাইরে এসে অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মত এই গৃহসেবিকা বৃত্তি বেছে নিচ্ছে। ফলস্বরূপ প্রতি বছরই নারী কর্মীর সংখ্যা (সে দিনমজুর হোক, পণ্য বিক্রেতা হকার হোক, কর্মচারী হোক বা গৃহসেবিকা হোক) বেড়েই চলেছে।

তথাকথিত ধনী পরিবারে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের গৃহসেবিকা হিসেবে কাজ করা একটি পুরোনো ও প্রচলিত প্রথা। আর মফস্বলের চেয়ে শহরাঞ্চলে এই জীবিকা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বিশেষতঃ গত কয়েক দশকে ভারতবর্ষের বড় বড় শহরের মত কলকাতার আশেপাশের জেলা, গ্রাম বা মফস্বল থেকে জীবিকার সন্ধানে, উন্নত জীবন-যাপন এবং আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় মানুষ অনেক বেশী শহরমুখী হয়েছে। সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে পরিবারগুলির কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। সংসারের আর্থিক যোগানদার হিসেবে গৃহবধূরা বা মেয়েরা যত বেশী চাকুরীজীবি বা পেশাজীবি হয়েছে ততই বেড়েছে এইসব গৃহসেবিকার চাহিদা। অন্য দিকে গ্রামে কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস—কারণ পরিবারে কৃষিজমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন হওয়ার ফলে জমির পরিমান ক্রমশই কমে যাওয়া, নতুন নতুন পেশার উদ্ভব এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা খেত মজুর বা চাষিরা যখন শিল্পায়নের মন্দা, বন্ধ কারখানা বা আর্থিক বেরোজগার শিকার হয়েছে, তখনই পরিবারের মেয়েরা বাধ্য হয়েছে বিকল্প উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে (দে ও বসু, ২০১১—১৮)।

এছাড়া চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক তত্ত্ব মেনেই ১৬—৬০ বছরের বিভিন্ন মহিলারা এই গৃহসেবিকার পেশায় যোগ দিচ্ছে নানা কারণে। কেউবা অভাবের তাড়নায়, কেউ বাড়ীতে স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, কেউ নিরূপায় হয়ে অর্থাৎ স্বামী মারা যাওয়ায় বা ছেড়ে চলে যাওয়ায় বা স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারকে আরও বেশি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সেবিকা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে এই দ্রুতগতি সম্পন্ন ব্যস্তময় জীবনে এইসব গৃহসেবিকারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বছরের প্রায় বারো মাসই অত্যন্ত সাধারণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে পরিষেবা আমাদের দিয়ে চলেছে তার একটু ব্যতিক্রম হলেই শহরের হিসেবী জীবন সমস্যার সম্মুক্ষীন হয়। অথচ এই সমস্ত গৃহসেবিকারা বিভিন্ন দিক থেকে অবহেলিত এবং এদের জীবনযাত্রায় উন্নয়নের ছোঁয়া আজও ঠিকমতো পৌঁছয়নি। আমরা জানি যে এইসব গৃহসেবিকারা অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে জাতীয় আয়ের একটা বড় জোগানদার হয়েও সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত ও বৈষম্যের স্বীকার (দে ও বসু, ২০১১ : ১৮)।

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীর অংশগ্রহণ ও স্বাধীন জীবিকার ইতিহাস পুরানো নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সমস্যাই বিগত ৫০—৬০ বছরে কিছু উচ্চ ও

মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীকে বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী কর্মে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু দরিদ্র তথা প্রান্তিক বর্গের নারীরা বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং নানা ধরনের অর্থ উপার্জনকারী পেশায় নিযুক্ত আছেন সেই প্রাচীনকাল থেকেই এবং আজও তারা অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। (বন্দ্যোপাধায়, ২০০৯ : ৪৫)।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বে গৃহসেবিকাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যদি ইউরোপের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, সেখানে গরীব ঘরের অধিকাংশ মেয়েকে কৈশোর বয়স থেকেই জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। ভারতের মত এখানেও জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসে সাধারণ ঘরের নিরূপায় মেয়েরা। যেখানে অবিবাহিত এবং নিঃসন্তান বিবাহিত মহিলাদের জন্য একাধিক উপার্জনের দিক যেমন—কলকারখানার কাজ, জিনিসপত্র ফেরি করার কাজ, কুলিগিরির পাশাপাশি গৃহসেবিকা পেশা গ্রহণ করতে পারত। (ঘোষ, ১৯৯৯ : ৫২)।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে পুরোনো সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে অনেক সংখ্যক পরিবার গৃহসেবিকা হিসেবে মেয়েদের রাখতে পারতেন। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে পুরুষের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আর বাড়ীতে চাকরের কাজ করতে চাইত না। ফলস্বরূপ মহিলা গৃহসেবিকার চাহিদা বাড়ছিল। ১৭৫০ সাল নাগাদ যেখানে ফ্রান্সের দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পর্যন্ত পুরুষ পরিচারক ছিল। সেখানে ১৭৯০ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রতি দশজন পরিচারকের মধ্যে ৮—৯ জন হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহিলা। কিন্তু সংগঠিত শ্রমিকদের মত গৃহসেবিকারা সামান্য সুরক্ষাটুকু পেত না (ঘোষ, ১৯৯৯ : ৫২)।

অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে সর্বত্রই গৃহসেবিকাদের কর্মস্থলে একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়। এইসব গৃহসেবিকাদের বিভিন্ন কারণে কাজ চলে যাবার ভয় কাজ করে। (যেমন—বেশী ছুটি নেওয়া, বোনাস নেওয়া, এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথা উপস্থাপন করা)। এর পাশাপাশি থাকত নিত্যদিনের মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন যা আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকা বা সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে জানতে পারি।

যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে গৃহসেবিকাদের সুরক্ষা বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ২০১৩ সালে। এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক শিবিরের বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এমন একটি শিবিরের নাম ছিল—"নিজে বাঁচ এবং অন্যকে বাঁচাও"। এই শিবিরে আলোচনার শুরুতেই মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বলা হয় যে এই সমস্ত মহিলারা অনেক রাতে বা ভোরে উঠে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কাজে আসায় যাতায়াতের রাস্তায় কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রাথমিক সমাধান হিসেবে বা সুরক্ষা হিসেবে গৃহসেবিকাদের কাজের বাড়ীর নম্বর, স্থানীয় থানা, লালবাজার কন্ট্রোল রুমের নম্বর এবং নিজেদের বাড়ীর মোবাইল নম্বর নিজেদের কাছে রাখার কথা বলা হয়। এছাড়া বর্তমানে কাজের বাড়ীতে নিত্য নতুন যন্ত্র আসায় সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং কাজের বাড়ীতে কাজের সময় চোট-আঘাত পেলে তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কিভাবে নিতে হবে সেই ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। এবং শ্রমদপ্তর স্বীকার করেছে যে এই ধরনের শিবির এলাকা ভিত্তিক আরো বাড়ানো হবে। (অশোক, ২০১২)।

পূর্বরচিত গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ :

Roy, Raka (2000) কর্তৃক রচিত *Fields of Protest – Women's Movement in India*. বইটিতে কলকাতা ও বম্বের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের কার্যাবলী ও তাদের আন্দোলনের ও প্রতিবাদের ক্ষেত্র সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বসু, দীপিকা এবং নির্বান বসু, অমল দাস, ইরা মিত্র ও রাখী রায়চৌধুরী (2002) কর্তৃক রচিত "সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক"। বইটিতে ভারতবর্ষ তথা বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের উপর শিল্প ও প্রযুক্তির প্রভাব সহ অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

চক্রবর্তী এবং সি. এন, ড. সচি চক্রবর্তী (2006) কর্তৃক রচিত *"Gender Justice"* পুস্তকটিতে মহিলা ও শিশুদের কিছু সাংবিধানিক অধিকার ও কাজের জায়গায় তাদের বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি পারিবারিক কাজে নিযুক্ত মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বইটিতে দেখান হয়েছে যে 70 শতাংশ মহিলা গ্রাম থেকে শহরে অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসে।

N, Neethe (2008) রচিত *"Regulating Domestic Work"* প্রবন্ধে পারিবারিক কাজে নিযুক্ত মহিলাদের কথা এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

মুখোপাধ্যায়, সোমা (2008) কর্তৃক রচিত "অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন" বইটিতে মহিলারা বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে কিভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করত এবং ক্ষমতায়নের জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করত তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Rao, D. Paulla কর্তৃক রচিত *Empowerment of Women Through Higher Education in India* প্রবন্ধে একবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়নের ইতিবাচক দিক হিসেবে উচ্চ শিক্ষায় মহিলাদের অংশ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী 2009 কর্তৃক রচিত নারী, শ্রেণি বর্ণ—"নিম্নবর্গের নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান", বইটিতে আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক নিম্নবর্গের নারীর অবদান ও তাদের শোষণ ও বঞ্চনার চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন—শিক্ষায়, কৃষি-অর্থনীতি, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে, সেবা বৃত্তিতে, রাজনীতি, পরিবারে নারীর অবস্থা ও তাদের সমস্যার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যানার্জি, আশা ও সমরাজিতা জানা (২০০৯) কর্তৃক রচিত—"গৃহসেবিকা একটি সমীক্ষাভিত্তিক প্রতিবেদন" মাসিক পত্রিকাটি গৃহসেবিকাদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দে, ভারতী ও তরুণ বসু (২০১১) কর্তৃক রচিত—"নারী ভাবনার বাইশ কথা" বইটিতে অনিয়মিত শ্রম ও গৃহভিত্তিক কাজের ফলে কিভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে তা বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি গৃহসেবিকা, সাফাইকর্মী, নির্মাণকারী, মাছের ব্যবসায়ী, কৃষি-বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত অসংগঠিত মহিলা কর্মীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

রায়, বিনা (২০১১) কর্তৃক রচিত "ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা" বইটিতে নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে পণ প্রথা, ভ্রূণ হত্যা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সহ শ্রমের বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদানের পাশাপাশি শিক্ষিত নারী অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্রিকা ছাড়াও বহু গবেষক, লেখক তাঁদের চিন্তাধারা ও গবেষণা বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন—(১) "দায় বেড়েছে পরিবারে ক্ষমতা নয়"—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ ডিসেম্বর ২০১২, (২) সেনগুপ্ত, অশোক "গৃহসেবিকাদের সুরক্ষা শেখাল শ্রমদপ্তর"—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ ডিসেম্বর ২০১২, (৩) বসু, পূরবী—নারী, মাতৃত্ব, সৃজনশীলতা (৪) পাণ্ডা, ঝর্ণা—"যে সব মেয়েদের কাজে আইনি কবজটুকুও নেই—এই সময় ২৭ নভেম্বর, ২০১৮।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই কাজটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি ক্ষেত্র সমীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন গৌণ তথ্য ব্যবহার করেছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন বই, পত্র -পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এককভাবে এবং গোষ্ঠীগতভাবে সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়েছি। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছি। এই কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে পরিসংখ্যানগত, বিশ্লেষণাত্মক ও তালিকা পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

সমীক্ষার ক্ষেত্র :

এই কাজটিকে সম্পন্ন করার জন্য কোলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত মোট ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০৯নং ওয়ার্ডটি নির্বাচন করেছি। ১০৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত শহিদ স্মৃতি কলোনীতে (থানা—পঞ্চসায়র) A. B. C. Block এর ৫৩৭টি প্লট-এর মধ্যে ৩০০টি পরিবারের গৃহসেবিকাদের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে অধিকাংশ ভাড়া বাড়ীতে বা নিজের বাড়ীতে বসবাস করে এবং এই বস্তির নিকটবর্তী ফ্ল্যাট বাড়ীতে গৃহসেবিকার কাজ করে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে এখানে বসবাস করছে। উক্ত ক্ষেত্র সমীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে অসংগঠিত শ্রমিক ও গৃহসেবিকা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ ও ফলাফল :

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে মূলত সংসারের অভাব-অনটন মেটাতেই চেনা-জানা সূত্র ধরেই অথবা নিজ থেকেই গৃহসেবিকা হিসেবে তারা এই পেশায় যুক্ত হয়েছে। অবশ্য এই অভাব-এর পেছনে বহুবিধ কারণ বর্তমান। সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে কারো স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে গৃহসেবিকা হিসেবে মহিলারা এই পেশাকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ মহিলা পারিবারিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে গৃহসেবিকা বৃত্তি গ্রহণ করেছে। নিম্নে সারণিচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণিচিত্র১ : গৃহসেবিকাদের কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কারণ

কারণ	সংখ্যা	শতাংশ
স্বনির্ভরতা	২৬৪	৮৮
আর্থিক অনিশ্চয়তা	৩৬	১২
মোট সংখ্যা	৩০০	১০০

১নং সারণিচিত্রের মাধ্যমে গৃহসেবিকাদের এই পেশায় যুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় ৩০০ জন গৃহসেবিকার মধ্যে ২৬৪ জন স্বনির্ভরতা এবং পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতা করার জন্য এই পেশাকে বেছে নিয়েছে। যদিও এদের মধ্যে অনেকের স্বামী অসুস্থতার কারণে কাজ করতে অক্ষম। আর্থিক অনিশ্চয়তার জন্য ৩৬ জন (১২ %) মহিলা এই পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। এই অনিশ্চয়তার পেছনে স্বামীর মৃত্যু এবং বিবাহ বিচ্ছিন্নতার কারণ রয়েছে।

ভারতের মতো জনবহুল দেশে শ্রমের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই কম হওয়ায় এইসব গৃহসেবিকারা কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় কাজবাড়ীতে নানা ধরনের অমানবিক ব্যবহার যা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। পাশাপাশি গৃহসেবিকাদের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণের সমস্যাটি জড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গৃহসেবিকাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি নিম্নবর্গুক্ত।

সারণিচিত্র ২ : গৃহসেবিকাদের শ্রেণিগত বিভাজন

জাতি	সংখ্যা	শতাংশ
তপশিলি জাতি	২০৫	৬৮.৩৩
সাধারণ	৮৭	২৯
ও.বি.সি.১	০২	০.৬৭
জানে না	০৬	০২
মোট সংখ্যা	৩০০	১০০

আলোচ্য ২ নং সারণিচিত্রের মাধ্যমে গৃহসেবিকাদের জাতিগত বিভাজন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩০০ জন গৃহসেবিকার মধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত গৃহসেবিকার সংখ্যা ২০৫ জন (৬৮.৩৩ %)। সাধারণ ৮৭ জন (২৯ %) । ও. বি. সি. ১ অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের ২ জন (০.৬৭ %) আর ৬ জন (২ %) গৃহসেবিকা বলতে পারেনি তারা কোন্ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। তবে আশ্চর্যের বিষয় ৮৯ জন সাধারণের গৃহসেবিকার মধ্যে মাত্র ২ জন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত; অথচ এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশী।

সারণিচিত্র ৩ : সম্প্রদায়গত বিভাজন

সম্প্রদায়	সংখ্যা	শতাংশ
হিন্দু	২৯৮	৯৯.৩৩
মুসলিম	০২	০.৬৭
মোট সংখ্যা	৩০০	১০০

৩নং সারণিচিত্রে গৃহসেবিকাদের সম্প্রদায়গত বিভাজন তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ৩০০ জন গৃহসেবিকার মধ্যে ২৯৮ জন (৯৯.৩৩ %) হিন্দু সম্প্রদায়। আর ২ জন (০.৬৭ %) মুসলিম সম্প্রদায়।

সারণিচিত্র ৪ হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিগত বিভাজন

হিন্দু সম্প্রদায়	সংখ্যা	শতাংশ
পৌণ্ড্র	১৯৮	৬৬.৪৪
কৈবর্ত	৬০	২০.১৩
ব্রাহ্মণ	১২	০৪.০২
বৈষ্ণব	১১	০৩.৬৯
ধোপা	০৯	৩.০২
নাপিত	০২	০.৬৭
সন্ন্যাসী	০১	০.৩৩
কামার	০১	০.৩৩
জেলে	০১	০.৩৪
কুমোর	০১	০.৩৩
মুচি	০১	০.৩৩
তাঁতি	০১	০.৩৪
মোট সংখ্যা	২৯৮	১০০

৪ নং সারণিচিত্রের গৃহসেবিকাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিভাজন আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে ২৯৮ জন হিন্দু সম্প্রদায় পরিবার ভুক্ত গৃহসেবিকার মধ্যে ১৯৮ জন পৌণ্ড্র সম্প্রদায় ভুক্ত

অর্থাৎ (৬৬.৪৪ %) শতাংশ। ৬০ জন (২০.১৩ %), কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণ ১২ জন (৪.০২%), বৈষ্ণব ১১ জন (৩.৬৯%), ধোপা ০৯ জন (৩.০২%), নাপিত ০২ জন (০.৬৭%), সন্ন্যাসী ০১ জন (০.৩৩%), কামার ০১ জন (০.৩৩%), জেলে ০১ জন (০.৩৪%), কুমোর ০১ জন (০.৩৩%), মুচি ০১ জন (০.৩৩%) এবং তাঁতি ০১ জন (০.৩৩%)। যদিও সম্প্রদায়গত ভাবে এরা এদের পেশা ছেড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন পেশায় বর্তমানে নিযুক্ত। ৪নং সারণিচিত্র থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে দেখা গেছে ব্রাহ্মণ মহিলারাও বর্তমানে এই পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে।

আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক প্রয়োজনে এই সব মহিলাদের চাহিদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের কাছে এই পেশা অর্থ-উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে। কারণ এই পেশায় যোগ্যতা বলতে তেমন কিছু লাগে না। এখানে কাজের ধরন অনুযায়ী গৃহসেবিকাদের মজুরী নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, জামাকাপড় পরিষ্কার করা যেগুলিকে ঠিকের কাজ বলা হয় সেখানে গৃহসেবিকারা বেশি যুক্ত।

কাজের ধরন	সংখ্যা	শতাংশ
রান্নার কাজ	৯২	৩০.৬৭
ঠিকের কাজ	১২৬	৪২
রান্না ও ঠিকের কাজ	৭১	২৩.৬৭
গৃহস্থলীর বিভিন্ন কাজ	১১	৩.৬৬
মোট সংখ্যা	৩০০	১০০

আলোচ্য ৫নং সারণিচিত্রের মাধ্যমে গৃহসেবিকাদের কাজের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে ৩০০ জন গৃহসেবিকার মধ্যে ৯২ জন গৃহসেবিকা রান্নার সঙ্গে যুক্ত। ঠিকের কাজ করে এমন গৃহসেবিকার সংখ্য ১২৬ জন। রান্না ও ঠিকের কাজ একসঙ্গে করে এমন গৃহসেবিকার সংখ্যা ৭১ জন। আর বাড়ীতে সব ধরনের কাজ করে এমন গৃহসেবিকার সংখ্যা ১১ জন। এছাড়া গৃহসেবিকাদের বেতন কাঠামো, তাদের কাজের বাড়ির সংখ্যা, বয়স প্রভৃতি বিষয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে।

সারণিচিত্র ৬ : গৃহসেবিকাদের মাসিক উপার্জন

মাসিক উপার্জন (টাকা)	সংখ্যা	শতাংশ
< ১০০০	০৫	১.৬৬
১০০১—৪০০০	১৫৬	৫২
৪০০১—৭০০০	১১৯	৩৯.৬৭

মাসিক উপার্জন (টাকা)	সংখ্যা	শতাংশ
৭০০১—১০০০০	১৮	৬
১০০০০ >	০২	০.৬৭
মোট সংখ্যা	৩০০	১০০

৬ নং সারণিচিত্রে গৃহসেবিকাদের মাসিক উপার্জন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে ১০০০ টাকা বা তার কম উপার্জন করে এমন গৃহসেবিকা ০৫ জন (১.৬৬%), ১০০১—৪০০০ টাকা উপার্জন করে ১৫৬ জন (৫২%), ৪০০১—৭০০০ টাকা উপার্জন করে এমন গৃহসেবিকার সংখ্যা ১১৯ জন (৩৯.৬৭%), ৭০০১—১০০০০ টাকা উপার্জন করে ১৮ জন (৬%), এবং ১০০০০ টাকার বেশি উপার্জন করে এমন গৃহসেবিকার সংখ্যা ২ জন (০.৬৭%)।

সার্বিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় বর্তমানে এই পেশা একটি অর্থকরী পেশায় পরিণত হয়েছে। এরা বর্তমানে কাজবাড়ীতে দরকষাকষি করে থাকে। কারণ সাম্প্রতিক কালে এদের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেছে। কারণ একদিকে কাজের প্রয়োজন এদের যেমন আছে তেমনই কাজের বাড়ীতে এদের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কলকাতা শহরে অধিকাংশ বনেদী বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চাকুরী বা অন্য কোনো কাজে যুক্ত থাকে। এদের ছাড়া যেন শহরের বাঁধাধরা জীবন ওলট-পালট হওয়ার উপক্রম।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সাংসারিক আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য মহিলারা এই পেশা বেছে নিচ্ছে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হওয়ার জন্য অন্য পেশায় যেতে পারে না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এই গৃহসেবিকার কাজ বেছে নিতে হয়। এছাড়াও তাদের মধ্যে রয়েছে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছা। সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এরা এদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। কারণ এরা অসংগঠিত শ্রমিক। একটি নারী পুরুষের পাশাপাশি পরিবারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। জীবনধারনের মান বজায় রাখে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়ে। জাতীয় ক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদনে নারীকে আরও বেশী অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব। তাই নারীকে কাজের সর্বক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দিতে হবে। শ্রমজীবী নারী তথা গৃহসেবিকাদের সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি সমাজের কল্যাণ ও প্রগতির স্বার্থে সমষ্টিগত ভাবে যেমন সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী নীতি গ্রহণ করতে হবে, তেমনই ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গতভাবে যারা এই সমস্যার দ্বারা পীড়িত তাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি সক্রিয়তা অর্জন করতে হবে।

নির্বাচিত সূত্র নির্দেশ :

ঘোষ, শাশ্বতী। ১৯৯৯। সমতার দিকে আন্দোলনে নারী, কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, এন. সি. এবং সচি চক্রবর্তী। ২০০৬। Gender Justice, কলকাতা।

জানা, সমরাজিতা এবং কৃষ্ণা চৌধুরী। ২০০৯। 'গৃহসেবিকা—একটি সমীক্ষাভিত্তিক প্রতিবেদন', দুর্বার ভাবনা, জুন, কলকাতা; আশা ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত।

দে, ভারতী এবং তরুণা বসু। ২০১১। নারী ভাবনার বাইশ কথা, কলকাতা; দুর্বার প্রকাশনী।

N. Neetha, 2008, 'Regulating of Domestic Work' *Economic and Political Weekly*, 45 (37).

পান্ডা, ঝর্ণা। ২০১৯। 'যে সব মেয়েদের কাজে আইনি কবজটুকুও নেই', এই সময়, ২৭ নভেম্বর।

বন্দোপাধ্যায়, কল্যানী। ২০০৯। *নারী, শ্রেণি ও বর্ণ-নিম্নবর্ণের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান*, কলকাতা; মিত্রম প্রকাশন।

বসু, দীপিকা এবং নির্বান বসু, অমলা দাস, ইরা মিত্র, রাখী রায়চৌধুরী। ২০০২। *সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক*, কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

মুখোপাধ্যায়, সোমা। ২০০৮। *অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন*, কলকাতা; মিত্রম প্রকাশন।

Rao, D. Paulla. 2008. Empowerment of women through Higher education in India, *South Asian Journal of Socio-Political Study*. Vol 8, January—June.

রায়, বীনা। ২০১১। *ভারতের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা*, কলকাতা; ফার্মা, কে. এল. প্রাইভেট লিমিটেড।

Risley, H. H. 1892. *Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, General Secretariat Press.

Roy, Raka. 2000. *Fields of Protest Women's Movement in India*, New Delhi : Kali for Women.

সেনগুপ্ত, অশোক। ২০১২। "গৃহসেবিকাদের 'সুরক্ষা' শেখাল শ্রমদপ্তর", *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৯ শে ডিসেম্বর।

নিজস্ব সংবাদদাতা। ২০১২। "দায় বেড়েছে পরিবারে, ক্ষমতা নয়", *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৯ ডিসেম্বর।

লেখক পরিচিতি :

১. জুনিয়র রিসার্চ ফেলো
ওমেনস্টাডিস রিসার্চ সেন্টার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২. অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর
অ্যানথ্রোপলোজি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়